আমার দেখা তুরস্ক

হাফিজুর রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

১ম পর্ব : প্রথম দিনগুলো ও তুরস্কের ইতিহাস ১১

- তার্কিশ এয়ারলাইন্স : ফ্লাইট নম্বর ৭১৩ ১১
- হাজি বাইরাম ডরমেটরি ১৬
- বাংলা খাবার : বাঙ্গালির জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ১৭
- ইউনুস এমরে ও হাজি বাইরাম ভালি ১৮
- তুর্কি ভাষা শিক্ষার প্রথম দিনগুলো ২০
- তুর্কি জাতির ইতিহাস ২২

২য় পর্ব : ভ্রমণ কথন ৩০

- ইস্তান্বুল : যেখানে নির্মাণ হয় সভ্যতা ৩০
- আয়াসোফিয়া : হাজার বছরের মর্যাদাপূর্ণ স্থান ৩২
- তোপকাপি : যে প্রাসাদ থেকে বিশ্ব শাসন করত উসমানিরা ৩৫

● দোলমাবাহচে প্রাসাদ : জাঁকজমকের আড়ালে পতনের স্থিরচিত্র	৩৯
● বসফরাস : এশিয়া-ইউরোপের সৌন্দর্য যেখানে একসাথে হয়েছে	৪২
● আদালার : প্রিন্স আইল্যান্ড নাকি প্রিন্সদের আইল্যান্ড	৪৫
● ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে প্রিয় দুটো স্থান	৪৬
● নান্দনিক স্থাপত্যের মসজিদের নগরী ইস্তাম্বুল	৪৭
● স্থাপত্য শিল্পে একজন কীর্তিমান এক পুরুষ : মিমার সিনান (১৪৮৯-১৫৮৮)	৫৪
● ইস্তাম্বুলের আরও কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও স্থান	৫৫
● ইস্তাম্বুল বিজয় ও একজন সুলতান মেহমেত	৫৯
● তুরস্কের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ইজমির	৬২
● জালালউদ্দিন রুমির স্মৃতিবিজড়িত শহর কোনিয়া	৬৮
● উসমানি খিলাফতের প্রথম রাজধানী বুরসা	৭৫
● ভূ-মধ্যসাগর দেখার গল্প	৭৯

- দক্ষিণ তুরস্কের রাজধানী খ্যাত প্রাচীন শহুর দিয়ারবাকির ৮৪
- আরও কিছু শহর ৮৮

৩য় পর্ব : মৌলিক বিষয়সমূহ ৯০

- জাতীয়তাবাদ : রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ৯০
- তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থা ৯৬
- তুরস্কের স্বাস্থ্যখাত ১০৫
- তুরস্কের যাতায়াত ও অবকাঠামো ১০৮
- তুরস্কে জনজীবন : সহজ নাকি কঠিন! ১১৪
- তুরস্কে বিয়ে ও বিয়ের সংস্কৃতি ১১৯
- একজন মেহমেদ চাচার গল্প; তুরস্কে পরিবার ও পারিবারিক জীবন ১২৪
- তুরস্কে জননিরাপত্তা ১২৯
- ব্যক্তি স্বাধীনতা ১৩১

৪র্থ পর্ব : নানা সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়াবলি ১৩৩

- তুর্কিদের খাবার-দাবার ১৩৩

● তুরস্কে ঈদের সংস্কৃতি ১৪২
● তুরস্কে মসজিদে জামায়াত ও ইবাদতের কিছু বিষয় ১৪৪
● তাসবিহ ও আংটি : তুরস্কের বহুল প্রচলিত দুটো বিষয় ১৪৭
● তুরস্কের ঘরদোর দেখতে যেমন ১৫০
● তুরস্কে প্রচলিত কুসংস্কার ১৫৪
● ইয়েনি দুনিয়া ভাকফি : তুরস্কে সিভিল সোসাইটির সংস্কৃতি ১৫৬
● যুবকদের যেভাবে গড়ছে তুরস্ক ১৬৩
● বুক ক্যাফে, মিল্লি কিরাতহানে এবং বই পড়ার সংস্কৃতি ১৬৬
● মুরব্বিদের হাতে চুমু খাওয়া ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা ১৬৬
● পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি দেশ ১৬৭
● কিছু সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে না বললেই নয় ১৬৯
● তুরস্কে এলাকাপ্রীতি ১৭০

● তুরস্কে গ্রামীণ জীবন ১৭২
● মহল্লাগুলোতে সাপ্তাহিক বাজার ১৭৩
● সাপ্তাহিক ছুটির দিন ১৭৫
● তুরস্কে সামাজিক জীবন ১৭৭
● মেহমানদের গ্রহণ করা ও বিদায় জানানো ১৮০
১৮১

৫ম পর্ব : রাজনীতি ও সমসাময়িক তুরস্ক
● আতাতুর্ককে যেভাবে দেখে তুর্কিরা ১৮১
● তুরস্কে সেক্যুলারিজমের সেকাল-একাল ১৮৪
● তুরস্কের রাজনৈতিক দল ১৮৯
● তুরস্কে ইসলামি রাজনীতি : সফলতা-ব্যর্থতার খতিয়ান ১৯০
● এরদোয়ান কি সত্যিই চেঞ্জ মেকার ১৯৫
● একে পার্টির সংগঠন ও রাজনীতি ২০০
● নির্বাচনী কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি ২০১

● তুরস্কে নির্বাচন ও নির্বাচনী সংস্কৃতি ২০৮
● সমসাময়িক তুরস্কের দুটো আলোচিত ঘটনা ও কিছু কথা ২১৩
●মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে তুরস্ক নতুন আশা ২২০
● তুরস্ক কি থেমে যাবে ২২৩

পরিশিষ্ট : তুরস্কে বিদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ২২৭

● স্কলারশিপে আবেদনের যোগ্যতা ২২৮
●স্কলারশিপে আবেদনের প্রক্রিয়া এবং সময়সীমা ২২৮
● তুরস্কে কলেজ পর্যায়ে সরকারি স্কলারশিপের সুযোগ ২৩০

১ম পর্ব

প্রথম দিনগুলো ও তুরস্কের ইতিহাস

তার্কিশ এয়ারলাইন্স : ফ্লাইট নম্বর ৭১৩

বিদেশে আসব, তাও পড়ালেখার জন্য– এটা একসময় কল্পনাতেও ছিল না। ২০১৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে মাস্টার্স শেষ হওয়ার পর অন্যান্য সহপাঠীদের মতো আমারও টার্গেট ছিল বিসিএস। তাই বিসিএস গাইড নিয়ে পড়াশোনা আর পরীক্ষার জন্য অপেক্ষাই ছিল তখন আমার মূল কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ফাঁকে মাদরাসাতে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিলাম এবং কামিল পরীক্ষার আরও এক-দেড় বছর বাকি ছিল।

তখনকার সেই সময়গুলো অবশ্য খুব ব্যস্ততায় কাটত। ছোটোবেলা থেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি সচেতনভাবেই নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কাজে নিজেকে সক্রিয় করেছিলাম সেই। স্বভাবতই বড়ো হওয়ার সাথে সাথে কাজের পরিধি ও দায়িত্ব বাড়তে থাকে।

২০১৩ সালের রমজান মাস। ইউরোপ-এশিয়ার সেতুবন্ধনের দেশ তুরস্কে অধ্যয়নরত একজন ছোটো ভাই দেশে এসে সাক্ষাৎ করে খুব করে আমাকে ধরে বসল। তার ভাষাটা যতটুকু মনে পরে তাতে এমনই ছিল,

> 'সবাই তো বিসিএসে যায়, কিংবা চাকরি করে। কিন্তু কিছু মানুষকে তো গবেষক হতে হবে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আপনারা না আসলে কারা আসবে? আপনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন।'

তার দৃষ্টি আকর্ষণ আমার চিন্তা-কাঠামোর গাঁথুনিতে আসন পেতে নিল। উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়ার

ট্র্যাডিশনাল ধারা বড়ো থেকে ছোটোদের দিকে, ছোটোরা বড়োদের সেই অর্থে উদ্দীপ্ত করার ফুরসত পায় না। আমাদের সামাজিক কাঠামো ছোটোদের এহেন ভূমিকাকে 'অতি পণ্ডিতি'র চাদর পরিয়ে দেয়। আদতে ছোটোরাও বড়োদের জন্য উৎসাহের কারণ হতে পারে অন্তত সেদিন আমি জীবন থেকে উপলব্ধি করেছিলাম। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কখনো একাডেমিক ক্যারিয়ার গড়ার টার্গেট ছিল না।

২০১৪ সালের শুরুতে তুরস্কে সরকারি স্কলারশিপের আবেদনের সময় এলো। যথারীতি আবেদন করে ফেললাম। মে মাসে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ভাইভার ডাক এলো। আধ ঘণ্টার একটি চমৎকার ভাইভা দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। ভাইভার পর থেকে প্রতীক্ষার আর শেষ নেই! কেন যেন মনে হচ্ছিল, পিএইচডি করার ডাক পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। অনেকের সাথে শেয়ার করেছি ব্যাপারটি। কিন্তু শেয়ার করার পরই ভাবতাম যদি না হয়, তাহলে তো লজ্জায় ডুবে মরব। তারপরও কেন যেন শেয়ার করে তৃপ্তি পেতাম।

২০১৪ সালের ২৫ জুলাই। রমাদান মাসের শেষ দিকে, সেহেরি খেয়ে সবেমাত্র ঘুমিয়েছি। সহকর্মী মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ ভাই ফোন দিয়ে বললেন, 'হাজিজ ভাই, মেইল চেক করুন প্লিজ।' বললাম : 'কী হয়েছে?' তিনি বললেন : 'চেক করেই দেখুন না!' আমরা দুজনেই ভাইভা দিয়েছিলাম। মেইলে ঢুকে খুশিতে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লাম। তুরস্কের গাজি ইউনির্ভাসিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন বিভাগে পিএইচডির জন্য অফার লেটার। নিজেকে আসলে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না।

অফার লেটার পাওয়ার পরও অবশ্য নানা কারণে যাওয়া না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বারবার আড়ষ্ঠ হয়েছি। কিছু মুহূর্তে জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই কঠিন; বিশেষ করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া, যা আপনাকে চেনা-জানা দুনিয়ার বিপরীতে এক অচেনা দুনিয়ার তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেবে। পরিবার, প্রতিবেশি, সমাজ, জন্মভূমির গ্রাম, বেড়ে উঠা শহর, বন্ধু সার্কেল, সহকর্মী, সংগঠন নিয়ে এক ধারাবাহিক স্বপ্নযাত্রার পথ এঁকেছি। কখনো

মসৃণ, কখনো অমসৃণ-পিচ্ছিল সে পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম স্বভাব নিয়মে। হঠাৎ এক ইউটার্ন-এর মুখোমুখি হয়ে খানিক সময়ের জন্য কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েছিলাম। কাছের কিছু মানুষ, কয়েকজন শিক্ষক, কতিপয় শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরিবারের সাথে পরামর্শ করলাম। বেশ কয়েকদিন নানা অনিশ্চয়তায় কাটল। অবশেষে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলাম। অচেনা এক নতুন দুনিয়ার সফরেই মুসাফির হওয়ার ঝুঁকি নিতে হৃদয় গহীন থেকেই তাড়না অনুভব করলাম। ভিসা প্রসেসিং শুরু হয়ে গেল। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে ফ্লাইটের মেইল আসলো।

এবার উড়াল দেওয়ার পালা। তাই বিদায় নিতে হলো পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং সংগঠনসহ আরও অনেক জায়গা থেকে। আসলে বিদায় নেওয়াটা অনেক কঠিন একটি কাজ। আপনি বিদায় নিচ্ছেন মানে সেখানে ইতিহাস হয়ে যাচ্ছেন। আপনার হাতে গড়া অনেক জিনিস ইচ্ছে করলেও দেখতে পারবেন না, ছুঁতে পারবেন না। এ এক অস্বস্তি, এ এক অপূর্ণতা। জীবনের বাঁকে বাঁকে

অনেক মানুষের সাথে পরিচয় ঘটেছে, সময়ের ব্যবধানে তাদের স্মৃতির আয়নাতে হয় তো আর আমার মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে না। আজ আমি প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ৫ হাজার ৬১৬ কিলোমিটার দূরে বসফরাসের তীরে চলে যাচ্ছি।

১৫ সেপ্টেম্বর ভোরে আমাদের ফ্লাইটের সিডিউল পড়ল। আগেরদিন রাতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। তাই ১৪ তারিখ দুপুরেই পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। দেশে থাকার সময় উত্তরায় একটি বাসায় থাকতাম, সেখান থেকেই বিমানবন্দরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। পরিবার থেকে বাহিরে থাকি ২০০3 সাল থেকে। প্রতিবার বাড়ি থেকে আসার সময়ই মা কান্না করতেন অথবা মন খারাপ করতেন; যদিও আব্বা আমার সামনে কখনো আবেগ প্রকাশ করেননি। কিন্তু এবার আব্বাও জড়িয়ে ধরে আবেগে আপ্লুত হলেন। দেশের বাহিরে যাওয়া নিয়ে এই প্রথম আমার কাছে মনে হলো যে, অনেক দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। মা-বাবা, ভাই কিংবা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে

চাইলেই আর সামনাসামনি কথা বলতে পারব না। সবুজাভ গ্রাম দেখতে চাইলেই শহর ছেড়ে পালাতে পারব না। মায়ের হাতের রান্না খাওয়ার লোভ সংবরণ করতেই হবে এবার!

বিকেলের দিকে কিছু কাছের বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে বিদায় নিয়ে উত্তরার সেই বাসায় আসলাম। দেখি আরও কয়েকজন বন্ধু-সহকর্মী ও বড়ো ভাইয়েরা বাসায় আসছেন। তাদের দেখে মনটা ভরে গেল। কিছুক্ষণ গল্প করে খেতে বসলাম। সেই খাওয়ার ঘটনায় একটি স্মৃতি আছে, যা এখানে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। চলে আসব বলে বাসায় হরেক রকমের মুখরোচক রান্না হয়েছিল। এদিকে ফ্লাইটের সময় ঘনিয়ে আসায় এয়ারপোর্টে যাওয়ার খুব তাড়া। দ্রুতই খেতে বসতে হলো। ৪/৫ জন একসঙ্গে বসছি। আইটেম সবই ঠিকঠাক, খাওয়াও শুরু করলাম। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল অন্য জায়গায়! টেবিলে ভাতের বাটিতে যে পরিমাণ ভাত ছিল, সেই পরিমাণ ভাত দিয়ে সবাই কোনো রকম একবার করে নিতে পেরেছিলাম। এত স্বাদের

আইটেম! কিন্তু, ভাত অল্প! যিনি রান্না করেছেন তিনি সবই ঠিকমতো রেঁধেছেন; শুধু ভাত ছাড়া। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। দুপুরের রান্না করা ভাত শেষ হওয়ার পর অর্ধেক ক্ষুধা নিয়েই খাওয়া শেষ করতে হলো। এরপর তুরস্কে যতবার ভাত নিয়ে কোনো গল্প মনে পড়ত কিংবা এখনও মনে পড়ে, তখনই সেই রাতের কথা মনে হয়।

বিমানবন্দরে এসে নানা জটিলতা ও আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বিমানে উঠলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো বিমানে উঠেছি। তার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নম্বর ৭১৩ (ঢাকা-ইস্তাম্বুল)। বেশ বড়ো আকারের বিমান। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। বিমান নিয়ে আমার মনে রূপকথার গল্পের পরিবহনের ন্যায় একটা কল্পনা কাজ করত। বিমানকে ভাবতাম খুবই বিলাসবহুল পরিবহন। কিন্তু বিমানের সাধারণ বিভাগ (Economy Class) মোটেই বিলাসবহুল নয়। বিমান নিয়ে যত গল্প আগে শুনেছি, তাতে মনে মনে যে রকম কল্পনা করতাম তা শুধু বিমানের Business Class তথা ভিআইপি বিভাগেই

বিদ্যমান, যেখানে চড়ার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরলাম। পাশাপাশি সিটে পরিচিত কয়েকজন বসায় নিজেকে একা মনে হলো না। উঠার আধাঘণ্টার মধ্যে বিমান ছাড়ল। আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। আমি আনমনা হয়ে গেলাম। জীবনের বিগত হওয়া বছরগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। শৈশব, কৈশোরকে পেছনে ফেলে যৌবনের সেরা সময়টাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন এক চ্যালেঞ্জিং জীবনের দিকে যাচ্ছি। অজানা-অচেনা নতুন এক গন্তব্যের পথিক আমি। সামনের দিনগুলো কেমন হতে পারে, তার একটা স্কেচ আঁকতে লাগলাম।

বিমানের জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে থাকলাম। অসাধারণ এক দৃশ্যপট চোখের সামনে। মনে হয় শূন্যের ওপর ভাসছি। মেঘগুলো অন্যরকম এক প্রশান্তি দেয়। মাঝে মাঝে মনে হয় বিশাল এক সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু না, ওগুলোর সবই

মেঘ। দিনের আলোতে এই মেঘগুলোকেই সমুদ্রের পানির মতো নীল রংয়ের মনে হয়। কখনো দেখা দেয় বিশাল বরফখণ্ড, বিশেষ করে শীতকালে।

অবশ্য রাতে বিমানে উঠলে মেঘগুলো ভেদ করে কখনো কখনো নিচের আলো দেখা যায়। মনে হয় পৃথিবীতে জোনাকি পোকাগুলো আলো ছড়াচ্ছে। তখন ভাবি, মানুষ আসলে কতই-না ছোটো। কিন্তু সামান্য একটু সম্পদ, জ্ঞানের কতই-না বাড়াবাড়ি মানুষ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো দালানকেই তো বিমানে ওপরে উড়ার সময় দেখলে খুপরির মতো মনে হয়, আর মানুষকে মনে হয় পোকামাকড়!

আট ঘণ্টার ফ্লাইট। পথ যেন ফুরোয় না। এমনিতেই বিমান নিয়ে আঁকা কল্পনার ভ্রম কাটার পর শুরুতেই কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম। সেই হতাশার সাথে যোগ দিলো দীর্ঘপথের বিরক্তি। অবশ্য বিমানের খাবারের আইটেম বিরক্তিতে কিছুটা হলেও ভাটা ধরিয়েছে।

ইস্তাম্বুল আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সময় তখন বারোটা ছুঁইছুঁই। বিমান থেমে গেল। বাংলাদেশি এক সাধারণ তরুণ হিসেবে উসমানি সালতানাতের ঐতিহ্যবাহী দেশ তুরস্কের মাটিতে নেমে আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা তখন নীলের রং ছড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ পরিপাটি ও সুন্দর একটি বিমানবন্দর। পরিবেশটা আমার কাছে বেশ নতুন মনে হলো। ইমিগ্রেশন সেরে রওয়ানা দিলাম অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের দিকে। এবারের যাত্রা আনকারা। ইস্তাম্বুলের এই বিমানবন্দরটি অনেক বড়ো। সেজন্য আন্তর্জাতিক টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল বেশ দূরে।

সময়ের স্বল্পতায় অনেকটা দৌড়িয়েই বিমানে চড়লাম। উঠামাত্রই বিমান ছাড়ল। একঘণ্টার ফ্লাইট, তাই বিমানে দেওয়া চা-কফি আর নাস্তা খেতেই নামার সময় হয়ে গেল। বিমান থেকে নেমে ব্যাগ সংগ্রহ করলাম। ইমিগ্রেশন ইস্তাম্বুলেই হয়েছিল, বিধায় এখানে আর ঝামেলা নেই। ব্যাগ সংগ্রহ করে বাহিরে আসতেই তামিরুল মিল্লাতের ক্লাসমেট আফজাল ভাই, ছোটো ভাই বোরহান, শফিক এবং

হাবিব আমাদের রিসিভ করল। এয়ারপোর্টের সার্ভিস বাস দিয়ে মূল শহরের দিকে রওয়ানা দিলাম। পুরোপুরি অপরিচিত এক দৃশ্য। গাড়ির হর্ন নেই, জ্যাম নেই। রাস্তার দুপাশে লাগানো চমৎকার ফুলগুলো যেন আমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। একটু এগোতেই বিলবোর্ডের লেখা চোখে পড়ল- Welcome to Ankara।

তুরস্কে আসার আগে দেশটা কেমন হতে পারে, তা নিয়ে একটা কল্পনা সাজিয়ে ছিলাম। না, আমার কল্পনার সাথে একদমই মেলেনি। দেশটা আসলে কল্পনার চেয়েও সুন্দর। রাস্তায় চলতে চলতে সুন্দর করে সাজানো বিল্ডিংগুলো চোখে পড়ল। সবকিছুতেই একটা শিল্পের ছোঁয়া আছে। আমার কল্পনা আর বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই চলে এলাম শহরে। নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নেমে ট্যাক্সিতে করে হাজি বাইরাম ডরমেটরিতে গেলাম, যেখানে যাওয়ার জন্য আগেই আমাদেরকে মেইলে জানানো হয়েছিল। গতকাল ঢাকার উত্তরার বাসায়, আর আজ আমার ঠিকানা হাজি বাইরাম ডরমেটরিতে। এই আমাদের

পৃথিবী! আমরা কেবল একজনের ইশারায় ছুটছি। আনকারা কিংবা ঢাকা- সবখানে যার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

হাজি বাইরাম ডরমেটরি

হাজি বাইরাম ভালি নামের ডরমেটরিটি নতুন। তাই তখনও ছাত্ররা সেখানে থাকা শুরু করেনি। সাথে থাকা আফজাল ভাই কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললেন। জানানো হলো কয়েকদিন ডরমেটরির বিপরীত প্বার্শের 'ইউনুস এমরে' নামক আরেকটি ডরমেটরিতে থাকতে হবে। তাই ব্যাগ-পত্রগুলো নিয়ে ওই ডরমেটরির অফিসে গেলাম।

আমরা তখন তুর্কি ভাষার কিছুই বুঝি না। আর তার্কিশ কর্মকর্তারাও ইংরেজির কিছুই বোঝে না। তুর্কিদের মধ্যে এ বিষয়ে আজব এক জাতীয়তাবোধ আছে। তারা ইংরেজি শিখতে চায় না। তুর্কিদের অধিকাংশই তাদের নিজের ভাষাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। দীর্ঘ সময় জুড়ে তারা বিশ্বের বড়ো একটি অংশকে শাসন করেছিল এই ভাষা দিয়ে, তাই বিশ্বায়নের নামে চাপিয়ে দেওয়া ইংরেজি ভাষা

শিখতে তাদের রক্ষণশীলতা বেশ দৃশ্যমান। আপনি বড়ো বড়ো তার্কিশ একাডেমিশিয়ান পাবেন, যারা একদমই ইংরেজি জানেন না কিংবা বলেন না। তুর্কি ভাষা নিয়ে দৈনন্দিন কার্যক্রম চালিয়ে নিতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। কারণ, তুর্কি ভাষা খুবই সমৃদ্ধ একটি ভাষা। আপনি গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বই, আর্টিক্যাল কিংবা ডকুমেন্ট তুর্কি ভাষায় পাবেন। এমনকী অনেক বই পাবেন যেগুলোর এখনও ইংরেজি অনুবাদ হয়নি। অবশ্য সম্প্রতি এই ধারার কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। তারা ইংরেজি শিখছে। ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারে ক্লাস শেষে ফেরার সময়ে ওদের স্কুল ছুটি হয়। পাতাল রেলের স্টেশনে যখন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় প্রায়শই স্কুলের বাচ্চাদের সাথে দেখা হতো। তখন তারা দলবেধে জিজ্ঞাসা করত- Hi, How are you? Where are you from? আমরা উত্তর দিয়ে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। তারা উত্তর দিলে খুব চমৎকার করে তারা বলত– Nice to meet you। এতটুকু বলতে পেরে তারা খুব

প্রশান্তি পেত আর আমরাও তাদের আগ্রহে খুশি হতাম।
ডরমেটরিতে ভাষার সমস্যা তখনকার মতো কেটে গেল। সাথে থাকা আফজাল ভাইসহ অন্যরা ফরম পূরণ করতে সহায়তা করলেন। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে রুমে গেলাম। আমাকে আর পারভেজ ভাইকে একই রুম বরাদ্দ দিয়েছিল। রুমে জিনিসপত্র রাখার পরই আফজাল ভাই বললেন, 'ভাই, চলেন আপনাদেরকে ক্যানটিন দেখিয়ে দিই।' আর আমাদেরও তখন প্রচুর ক্ষুধা। ক্যানটিনে দুটো করে মুরগির রোস্ট আর সামান্য কিছু ভাত দিলো। মুরগির রোস্টকে আমাদের দেশে জামাই আপ্যায়ন হিসেবেই মনে করা হয়। সেজন্য এর প্রতি আগ্রহ সবারই থাকে। ক্যানটিনে রোস্ট দেখে মনে হলো যাই হোক, তুরস্কে এসে প্রথম খাবারটা জামাই আদরেই হবে। কিন্তু মুখে দিতেই বাঁধল বিপত্তি! মসলা ছাড়া স্বাদহীন এক খাবার। মনে হয় শুধু হলুদ দিয়ে তেলে ভেজে রেখেছে। খাবারে গোড়াতেই গলদ। জামাইকে অপমান! অনেকটাই হতাশ হয়ে পরলাম। অবশ্য কিছুক্ষণ

পরই আফজাল ভাইয়ের বাসায় বাংলা খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

বাংলা খাবার : বাঙ্গালির জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ

ডরমেটরির কাজ শেষ করে দুই-তিনদিন আফজাল ভাইয়ের বাসাতেই ছিলাম। মোবাইল সিম কেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসহ বেশ কিছু কাজ সেখান থেকেই শেষ করলাম। পাশাপাশি আনকারার প্রয়োজনীয় কিছু জায়গা ঘুড়ে দেখার সুযোগ হলো। এ কদিন আফজাল ভাইয়ের হাতের রান্না খেয়ে বেশ কাটিয়ে দিলাম। ঠিক তখনও বাংলা খাবারকে ততটা মিস করা শুরু করিনি। ডরমেটরিতে যাওয়ার পর ২/৩ দিন টানা তার্কিশ খাবার খাওয়ার পর বাংলা খাবারের জন্য অনেকটা পাগলের মতো হয়ে গেলাম। তার্কিশ খাবার আর রুচিতে যাচ্ছে না। শুধু খাওয়ার জন্য খাওয়া। ওদিকে আফজাল ভাইদেরও ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমরা তখন ভাষাও বুঝি না। বাহিরে বের হয়ে রেস্টুরেন্টে ভাত কিনে খাব তারও সুযোগ নেই। কিন্তু না, নিজেদেরকে আর ধরে রাখতে পারলাম না।

অবশেষে পারভেজ ভাই আর আমি বের হলাম। অনেক খুঁজে এক রেস্টুরেন্টে বসলাম, যেখানে দেখলাম ভাতের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভাত কীভাবে চাইব? খাব কী দিয়ে? ভাষার তো কিছুই বুঝি না। টেবিলে বসে ওয়েটারকে কেমনে যেন ভাতের ব্যাপারটা ইশারায় বোঝালাম। এক বাটি ভাতের সাথে নিরামিষ বেগুন তরকারি দিয়ে দুজন কোনো রকম খেলাম। তাতেই বেজাই খুশি। অন্তত তিনদিন পরে হলেও বাংলা খাবারের মতো কিছুটা খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি।
কিন্তু বিল দেখে আমাদের চোখ পুরোই চরক গাছ। ৪২ লিরা বিল এসেছে। তখন ৪২ লিরায় প্রায় ১৪০০ টাকার মতো। বাংলাদেশে হয় তো এরকম ভাত ও নিরামিষ বেগুন তরকারি খেতে ৭০-৮০ টাকা লাগত।

প্রথম দিনগুলোতে প্রায়শই এভাবে বাংলা খাবরের জন্য হাঁপিয়ে উঠতাম। অবশ্য আফজাল ভাই আর বুরহানের বাসা আমাদের জন্য কিছুটা হলেও সহজ করে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে এরকম অনেকে

আছেন, যারা ওই শহরে প্রথম বাঙালি হিসেবে এসেছেন। তাই এক বছরেও বাংলা খাবার চোখে দেখেনি। কয়েকজনকে আমি নিজে দেখেছি, যারা কয়েক মাস পর বাংলা খাবার (ভাতের সাথে আলু ভর্তা আর ডাল) পেয়ে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যেন এতদিন কিছুই খাননি। এই লেখা যারা মাতৃভূমি বাংলাদেশে বসে পড়ছেন, হয়তো ভাবছেন– এটা কোনো বিষয় হলো? বাংলা খাবার খাব না, তাতে এমন কী হবে! কিন্তু বাস্তবতা বড়োই কঠিন। তুরস্কে আমার চার বছরের বেশি সময় হয়ে যাচ্ছে। তুর্কি সব খাবার খেতে পারি এবং ভালোই লাগে। কিন্তু এখনও টানা এক সপ্তাহ বাংলা খাবার না খেলে মনে হয়; জীবনে কী যেন একটা নেই! জন্মের পর থেকেই আমরা এক বিশেষ বাঙালি খাবারের ঘ্রাণ পেতে পেতে বড়ো হয়েছি। সে ঘ্রাণেই যেন প্রাণ!

ইউনুস এমরে ও হাজি বাইরাম ভালি

ওপরেই উল্লেখ করেছি, আমার ডরমেটরির নাম ছিল 'হাজি বাইরাম ভালি ডরমেটরি'। শুরুর কয়েকটা দিন থাকতে হয়েছিল ইউনুস এমরে ডরমেটরিতে। হাজি বাইরাম ও ইউনুস এমরে এই দুজন ব্যক্তি তুরস্কে খুবই প্রসিদ্ধ। উনাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে আসলে লেখাটা অপূর্ণাঙ্গই থেকে যাবে।

ইউনুস এমরে (১২৩৮-১৩২১)

মঙ্গোলিয়ানরা যখন আব্বাসি খেলাফতকে তছনছ করে দিয়ে বিশ্বে মুসলমানদের শাসনকে দুর্বল করতে অভিযান শুরু করেছিল, ঠিক সেই সময়ে আজকের তুরস্কের এসকেশিহির শহরে জন্ম ইউনুস এমরের। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম একজন কবি ও সুফি ছিলেন তিনি। তার লেখা এখনও স্রষ্টাপ্রেমী মানুষদের ঈমানি চেতনাবোধকে জাগিয়ে তোলে। মানুষকে সম্মান করা, ভালোবাসা এবং সর্বোপরি শান্তিময় একটি সমাজ তৈরিই ছিল তার লেখার অন্যতম বিষয়বস্তু। তাসাউফ দুনিয়ার

অন্যতম পুরোধা জালালউদ্দিন রুমির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। রুমির কাছেই তিনি সুফিবাদের শিক্ষা নিয়েছেন। আজকের তুরস্কে ইউনুস এমরেকে সাহিত্য জগতের অন্যতম এক তারকা হিসেবে গণ্য করা হয়। ইউনুস এমরে এবং তার রচনাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাত শতাব্দী পরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা কিংবা এলাকার নামকরণ তার নামে করা হয়। তুরস্ক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বজুড়ে থাকা তুর্কি ভাষা শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো 'ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট' নামে পরিচালিত। আপনি তুরস্কে এমন পৌরসভা খুব কমই খুঁজে পাবেন, যেখানে ইউনুস এমরের নামে মহল্লা, সড়ক কিংবা কমিউনিটি সেন্টার নেই। সম্প্রতি বাংলা ভাষায়ও তার বেশ কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে।

হাজি বাইরাম ভেলি (১৩৫২-১৪২৯)

হাজি বাইরাম ভেলির (ওলি তথা পিরের তুর্কি শব্দ ভেলি) মূল নাম নোমান বিন আহমেদ বিন মাহমুদ।

তবে ‘হাজি বাইরাম’ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ছোটো বয়স থেকেই তাফসির, হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। আনকারার একটি মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হন। পরবর্তী সময়ে তাসাউফে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার মাদরাসা ও ইবাদতখানায় লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে। হাজি বাইরাম সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ওলিদের একজন ছিলেন। তার মৃত্যুর ছয়শত বছর পর আজও আনকারার লোকজন তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধক ও সুফি হিসেবে হাজি বাইরামকে স্থান দেয়। প্রায়ই লোকজনদের বলতে শুনি, ‘আনকারা দা হাজি বাইরাম ভেলিনিন মানেভি আতমোসফেরি আলতিনদা– যার অর্থ : আনকারা হাজি বাইরামের আধ্যাত্মিকতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।’ আমার সেই ডরমেটরির পেছনেই ছোট্ট একটা টিলা। সেখানেই শুয়ে আছেন হাজি বাইরাম সাহেব। তার কবরের পাশের মসজিদের নাম ‘হাজি বাইরাম ভেলি মসজিদ’। হাজি বাইরাম মসজিদটি শুধু আনকারার

নয়; বরং তুরস্কের অন্যতম পুরাতন মসজিদের একটি। পাশাপাশি এখানে রোমান, সেলজুক ও উসমানীয়দের স্মৃতি রয়েছে। এজন্য আনকারায় কেউ ভ্রমণে আসলে হাজি বাইরাম মসজিদ তাদের চেকলিস্টে থাকে। তবে কবর নিয়ে এখানে কোনো ধরনের শিরক নেই। মানুষজন আসেন, কবর জিয়ারত করেন– ঠিক এতটুকুই।

গত চার বছরে এখানে কোনো ধরনের ওরস কিংবা মাহফিল (আমাদের দেশে যা হয়) হতে দেখেনি। তবে হাজি বাইরামের মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে তার জীবনির ওপর নানা সেমিনার ও কনফারেন্স হতে দেখিছি।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সেক্যুলার তুরস্কে ক্রমান্বয়ে ইসলামি ভাবধারা ফিরিয়ে আনতে ব্যাপকভিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান সরকার। এ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সবচেয়ে কার্যকর একটি নীতি আমি খুব অবাক হয়ে খেয়াল করি। তিনি ইসলামি ভাবধারায় রাষ্ট্র ও জনগণকে ফিরিয়ে

আনতে তুরস্কের পির, সুফি, মুসলিম মনীষী ও আলেমদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেন; বিশেষ করে যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। যেমন, আনকারার ক্ষেত্রে হাজি বাইরাম ভেলি, কোনিয়ার ক্ষেত্রে জালালউদ্দিন রুমি কিংবা নেভশিহিরের ক্ষেত্রে হাজি বেসিকতাস ভেলি। আরেকটু স্পষ্ট করে বলি। এই ধরুন, এরদোয়ান যখন আনকারায় বক্তব্য দেন, তখন এভাবে বলেন :

> ‘আনকারার মূল্যবোধ কেমন হবে? আনকারার লোকজনকে কার মতো হতে হবে? হাজি বাইরাম ভেলির মতো। কোনিয়া এমন শহর যেখানে মাওলানা (জালালউদ্দিন রুমি) শুয়ে আছেন।’